৬.২ পঞ্চমহাব্রত

Mahaavratas or Five Great Vows

অহিংসা, সূনৃত বা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি হল জৈন নীতিশাস্ত্রসম্মত পঞ্চব্রত

যা মুক্তিকামী প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য পালনীয়। 'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ'। মঠবাসী সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে এই পাঁচটি ব্রত কঠোরভাবে পালনীয় হওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে এই পাঁচটি ব্রত হল 'পঞ্চমহাব্রত'। পাঁচটি মহাব্রতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল—

(i) অহিংসা ঃ পঞ্চমহাব্রতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হল অহিংসা। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' অন্য চারটি ব্রত **অহিংসাব্রতেরই অঙ্গস্বরূপ**। কায়, মন ও বাক্যে অহিংস হতে হবে। কায়িকভাবে (শারীরিকভাবে), মানসিকভাবে এবং বাচিকভাবে কোন জীবের ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্তা না করা, ক্ষতিকর কথা না বলাই অহিংসা। এই তিনপ্রকার অহিংসাকে বলা হয় **'ত্রিগুপ্তি'**। হিংসা করা, অন্যকে হিংসায় প্ররোচিত করা, অপরের হিংসাত্মক কর্মকে সমর্থন করা—এসবই 'হিংসার' অন্তর্গত। জীবহত্যামাত্রই হিংসার অন্তর্গত—অসতর্কভাবে জীবহত্যাও হিংসাত্মক। বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র জীবাণু যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার জন্য নিহত না হয়, সেজন্য অহিংসাব্রত সঠিকভাবে পালন করতে হলে নাসারন্ধ্রে শ্বাস-জালিকা ব্যবহার করতে হবে। আবার, অহিংসার কেবল না-মূলক দিকই নেই, হ্যাঁ-মূলক দিকও আছে। কেবল ক্ষতি না করাই 'অহিংসা' নয়, সর্বজীবে (জঙ্গম ও স্থাবর) প্রেম বিতরণ এবং হিতকর কর্মানুষ্ঠানও অহিংসার অন্তর্গত। শ্রমণদের ক্ষেত্রে অহিংসাব্রত কঠোরভাবে পালনীয়।

(ii) সত্য বা সূনৃত ঃ 'সূনৃত' বলতে বোঝায় 'উপাদেয় ও উপকারী'। যা উপাদেয় ও উপকারী তাই সত্য। **সত্য বা সূনৃত প্রকৃতপক্ষে অহিংসাব্রতেরই অন্তর্গত।** অসত্য বা মিথ্যা কথন হল 'বাচিক-হিংসা' যা অপরের মনকে আহত করে। এজন্য মিথ্যাকে পরিহার করে সত্য কথন, হিতকথন ও প্রিয়কথনই হল 'সত্যব্রত'। সত্যব্রতকে কঠোরভাবে পালন করতে হলে মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমণকে নিন্দাসূচক, অহিতকর ও অপ্রিয় চিন্তা থেকে, কর্ম থেকে ও বাক্য থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত থাকতে হবে।

(iii) অস্তেয় ঃ ছলে, বলে বা কৌশলে অপরের সম্পদ গ্রহণ করা বা অধিকার করা হচ্ছে **'স্তেয়'**; আর চাতুরী বা বলপূর্বক অপরের সম্পদ গ্রহণ না-করা বা অধিকার না-করা হচ্ছে **'অস্তেয়'**। 'অস্তেয়' বলতে সাধারণত বোঝায় 'অচৌর্য' বা 'অপরের সম্পদ চুরি না করা।' **স্পষ্টতই, 'অচৌর্য' ব্রতও 'অহিংসা' ব্রতেরই অন্তর্গত।** অপরের সম্পদ চুরি করলে অপরকে আহত করা হয়। কাজেই চৌর্য হল হিংসা, অচৌর্য অহিংসা। জৈন নীতিশাস্ত্রে আবার 'অস্তেয়' শব্দটিকে সাধারণ অর্থে প্রয়োগ না করে বিশেষ এবং কঠোর অর্থে প্রয়োগ করে বলা হয়েছে, **'সানন্দ-দান ব্যতীত কোন অবস্থাতেই অপরের সম্পদ গ্রহণ না করা।'** ভিক্ষাজীবী জৈন শ্রমণ সেইমতো ভিক্ষা-গ্রহণ করবেন যেটুকু ভিক্ষা গৃহস্থ সানন্দে দান করে, শ্রমণ নিজের ইচ্ছাজ্ঞাপন করে কোন ভিক্ষা গ্রহণ করলে তা 'স্তেয়' বা চৌর্যবৃত্তির সমতুল্য হবে।

(iv) ব্রহ্মচর্য ঃ কাম-দমন ব্রতই ব্রহ্মচর্য। 'ব্রহ্মচর্য' বলতে সাধারণত বোঝায়, 'জননেন্দ্রিয়কে সংযত রাখা'। জৈন নীতিশাস্ত্রে 'ব্রহ্মচর্য' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে বলা হয়েছে—কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপারে অর্থাৎ সর্ববিধ যৌনব্যাপারে কঠোর সংযম পালন কর। কায়মনোবাক্যে কামদমনই ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য শ্রমণকে অন্তরে-বাইরে, দেহে-মনে পরিপূর্ণভাবে সংযত হতে হবে। **স্পষ্টতই, ব্রহ্মচর্য ব্রতও অহিংসা ব্রতের অন্তর্গত।**

(v) অপরিগ্রহ ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় না করাই হল অপরিগ্রহ ব্রত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করলে দরিদ্রকে তার সম্পদ থেকে এবং ক্ষুধার্তকে তার খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা হিংসারই নামান্তর। কাজেই, **অহিংস হতে গেলে অপরিগ্রহ ব্রত পালন একান্ত প্রয়োজনীয়।** শ্রমণকে হতে হবে বিষয়ত্যাগী সন্ন্যাসী। কখনো কোন শ্রমণের তার প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ কোনভাবে সঞ্চিত হলে, সেই উদ্বৃত্ত সম্পদের সবটাই দরিদ্রদের খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণে ব্যয় করতে হবে। মুক্তিকামীর বিষয়াসক্তি মুক্তি-পথের প্রতিবন্ধক। এজন্যই মুমুক্ষুর অপরিগ্রহব্রত পালনীয়।

মঠবাসী **শ্রমণদের আচরণ যাতে সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ কঠোরভাবে অহিংস হয়,** এই উদ্দেশ্যে জৈন নীতিশাস্ত্রে পঞ্চমহাব্রত ও ত্রিগুপ্তির সঙ্গে **পঞ্চসমিতি** বা সহকারী নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চসমিতিকে অনেকসময় **'পঞ্চভাবনাও'** বলা হয়। পঞ্চসমিতি হল ঃ

১। **ঈর্যা সমিতি :** পথ চলার সময় যাতে কোন জীবহত্যা না হয়, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি পদতলে দলিত না হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

২। **ভাষা সমিতি :** সংযতবাক্ হতে হবে; অতিকথন যাতে অপরের মনোকষ্টের কারণ না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৩। **এষণা সমিতি :** খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে নিস্পৃহ হতে হবে,—'কেবল তারই প্রয়োজনে খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে' এমন কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা যাবে না।

৪। **আদান সমিতি :** অসতর্কতাবশত যাতে অতিক্ষুদ্র জীবাণু ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য নাক, মুখ, পদতল ইত্যাদিতে বিশেষ দ্রব্য (যেমন, নাকে ও মুখে আচ্ছাদন) ব্যবহার করতে হবে।

৫। **উচ্চার বা পরিথাপানিকা সমিতি :** অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে পরিত্যাগ করতে হবে।

জৈন নীতিশাস্ত্রে শ্রমণদের জন্য যে অহিংসাব্রতের উল্লেখ করা হয় তা চরম অর্থে অহিংসা। বিশেষ করে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের তেরাপন্থীগণ অহিংসাকে চরম অর্থে গ্রহণ করে বলেন, ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত, পরিহার্য অথবা অপরিহার্য প্রাণীহত্যা অর্থাৎ হিংসার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সব রকম হিংসা থেকে—ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, পরিহার্য-অপরিহার্য হিংসা থেকে—সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকাই হল অহিংসা। তেরাপন্থীদের মতে, জীবহত্যা মাত্রই হিংসা, তা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, পরিহার্য অথবা অপরিহার্য যাই হোক্ না কেন। অনৈতিক হিংসার পথ ধরে নৈতিক জীবনের পরাকাষ্ঠা মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

'এমন কঠোর অহিংসাব্রত পালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভব। বায়ুর সঙ্গে, ওজোনের (ozone) সঙ্গে, খাদ্যবস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ-অযোগ্য অতিক্ষুদ্র জীবাণু মিশ্রিত থাকে যাদের জল, বায়ু ও খাদ্য গ্রহণের সময়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও হত্যা করতে হয়। **চরম অর্থে অহিংসাব্রত পালন করতে গেলে তাই জীবনধারণই সম্ভবপর হয় না,** কেননা খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করে জীবনধারণ করা যায় না।[১] কাজেই বাস্তব জীবনে জৈন নীতিশাস্ত্রসম্মত ও তেরাপন্থী নির্দেশিত কঠোর অহিংসাব্রত (চরম অর্থে অহিংসাব্রত) পালন সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অহিংসাবাদী গান্ধীজিও জৈনদের কঠোর অহিংসাব্রত উদ্‌যাপনকে সম্ভব বলেননি। গান্ধীজির মতে 'জীবহত্যাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে মানুষের পক্ষে জীবনধারণই সম্ভব নয়।' জীবহত্যার ইচ্ছা না থাকলেও মানুষ তার পান-ভোজনের সময়, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়, বসে থাকা, দাঁড়িয়ে থাকা বা পথ চলার সময় অসংখ্য অতিক্ষুদ্র জীবাণুদের হত্যা করে।[২] কাজেই চরম অর্থে অহিংসাব্রত পালন করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

পঞ্চমহাব্রতের অন্তর্গত অপর চারটি ব্রত সম্পর্কেও (সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ সম্পর্কেও) একই কথা প্রযোজ্য। বাস্তব জীবনে সংসারী মানুষ এই ব্রতকে চরম বা কঠোর অর্থে অনুসরণ করতে পারে না,—চরম অর্থে পালন করতে গেলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ সংসারে বসবাস করাই সম্ভব হয় না।

কিন্তু পঞ্চমহাব্রতের পৃষ্ঠপোষক জৈন তেরাপন্থীগণ বাস্তব জীবন (practical life) ও আধ্যাত্মিক জীবনের (spiritual life) পার্থক্য করে বলেন যে, কঠোর অহিংসাব্রত সংসারী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সম্ভব না হলেও মুক্তিকামী সন্ন্যাসী বা শ্রমণের জীবনে সম্ভব। ব্যবহারিক জীবনে সার্থকতা লাভের বাসনাকে সর্বৈব পরিত্যাগ করে যিনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভকেই পরমার্থরূপে গণ্য করেন সেই মুমুক্ষু শ্রমণের কাছে কঠোরভাবে পঞ্চব্রত পালন সম্ভব। **শ্রমণদের জন্য নির্ধারিত পঞ্চব্রত তাই পঞ্চমহাব্রত—চরমকৃচ্ছ্রসাধনের পথ ধরে অবশ্য পালনীয় ব্রত।** পঞ্চমহাব্রত অনুশীলনের মাধ্যমেই মুমুক্ষু শ্রমণ তার অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনাকে রূপায়িত করে অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন, অনন্তশক্তি ও অনন্ত-আনন্দ—এই **'অনন্ত চতুষ্টয়ের'** অধিকারী হয়ে এই জীবনে মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করেন।

---

১. Jaina-Sutra,Part II (Uttaraadhayana) Lecture 4 pp 129-30
Translated by Hermann. Edited by Max Muller. Lowprice Publisher, Delhi, India, 1995.

২. Buddha Aura Ahimsaa. Gandhi Mahaatma. Ed by A. T. Hingorani, Bombay, P. 175.

৬.৩ পঞ্চঅণুব্রত
Pancha Aṇuvratas or Atomic vows

জৈন নীতিশাস্ত্রে, বিশেষ করে মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের নৈতিক জীবনধারণ প্রণালীর প্রতি, নৈতিক বিধি-বিধানের প্রতি, গুরুত্ব আরোপ করা হলেও সংসারী মানুষ **শ্রাবকদের** নৈতিক জীবনকে অবহেলা করা হয়নি। জৈন নীতিশাস্ত্রে একথাই বলা হয়েছে যে, মুক্তিলাভের জন্য সংসারী মানুষের কাছে অর্থাৎ শ্রাবকের কাছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর (শ্রমণের) চরমকৃচ্ছ্রতা অনুসরণীয় নয়—**শ্রাবককে পরিমিত ও সংযত ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগের দীক্ষা নিতে হবে।** মঠবাসী সন্ন্যাসীর জন্য নির্ধারিত 'মহাব্রত' পালন করতে হলে যে প্রকার কৃচ্ছ্রতার পথ অনুসরণ করতে হয় তা সংসারী মানুষ শ্রাবকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য জৈন নীতিশাস্ত্রে শ্রাবকদের জন্য 'অণুব্রতের' উল্লেখ করা হয়েছে। 'অণু' হল 'মহা'-এর বিপরীত। 'মহা' অর্থে 'চরম' বা 'কঠোর'; 'অণু' অর্থে 'সহজ' বা 'সরল'। **শ্রমণদের জন্য তাই 'পঞ্চমহাব্রত' নির্ধারিত হয়েছে আর শ্রাবকদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে 'পঞ্চঅণুব্রত' বা 'পঞ্চসহজব্রত'।**

পঞ্চমহাব্রতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অহিংসাব্রতের উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝানো গেল। অহিংসাব্রত পালনের জন্য শ্রমণদের কাছে জীবহত্যা সর্বৈব পরিত্যাজ্য। এমনকি বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র জীবাণু যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার দ্বারা নিহত না হয়, সেজন্য শ্রমণদের শ্বাসজালিকা ব্যবহার আবশ্যিক। গৃহীর অর্থাৎ শ্রাবকের কাছে এপ্রকার কঠোর অহিংসাব্রত অবশ্য পালনীয় নয়। প্রাণধারণের জন্য, কৃষিকাজের জন্য, শ্রাবক যদি এক ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব হত্যা করে (যেমন—বৃক্ষ, তরুলতা, ইত্যাদি যা জৈনমতে এক ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব) বা ছেদন করে, অথবা প্রাণধারণের জন্য সেসব খাদ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে তা অনৈতিকরূপে গ্রাহ্য হবে না। পঞ্চব্রতের অন্তর্গত অপরাপর ব্রতগুলিও শ্রাবকদের কাছে এই প্রকারে সহজভাবে অনুসরণীয়। এজন্যই শ্রাবকদের অনুসরণীয় পাঁচটি ব্রতকে বলা হয় 'পঞ্চঅণুব্রত।'

'অহিংসাব্রতের' কঠোরতাকে অণুব্রতে নিম্নোক্তভাবে শিথিল করা হয় ঃ

১। ক্ষতিকর নয় এমন কোন সচল জীবকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবো না;
২। আত্মহত্যা করবো না;
৩। ভ্রূণহত্যা করবো না;
৪। হিংসাত্মক কর্মে যুক্ত এমন কোন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবো না;
৫। কোন মানুষকে অস্পৃশ্যরূপে গণ্য করবো না;
৬। কোন মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবো না।

তেমনি, 'সত্যব্রতের' কঠোরতাকে অণুব্রতে নিম্নোক্তভাবে শিথিল করা হয় ঃ

১। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওজনে ফাঁকি দেব না;
২। দুরভিসন্ধি নিয়ে মিথ্যা বলবো না;
৩। অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করবো না অথবা মিথ্যা সাক্ষী দেব না;
৪। আত্মস্বার্থে অথবা বিদ্বেষবশত অপরের জীবনের গুপ্তকথা প্রকাশ করবো না;
৫। অপরের গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দিতে অস্বীকার করবো না,
৬। জাল-জালিয়াতিকে প্রশ্রয় দেব না।

'অস্তেয়ব্রতে'র কঠোরতাকে অণুব্রতে নিম্নোক্তভাবে শিথিল করা হয় ঃ

১। সম্মতি না নিয়ে অপরের সম্পদ গ্রহণ করবো না;
২। জেনেশুনে চোরাইমাল ক্রয় করবো না;
৩। নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসা করবো না;
৪। ব্যবসায়ে ধর্মবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করবো না;
৫। কোন সংস্থার কর্মীরূপে তহবিল তছরূপ করবো না।

ব্রহ্মচর্যব্রতে'র কঠোরতাকে অণুব্রতে নিম্নোক্তভাবে শিথিল করা হয় ঃ

১। ব্যভিচার অথবা গণিকাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকবো;
২। বিকৃত যৌন-ক্রিয়া থেকে বিরত থাকবো;
৩। মাসে অন্তত কুড়ি দিন স্ত্রীসঙ্গ থেকে বিরত থাকবো;
৪। অষ্টাদশ বৎসরকাল পর্যন্ত কৌমার্য পালন করবো।

'অপরিগ্রহব্রতের' কঠোরতাকে অণুব্রতে নিম্নোক্তভাবে শিথিল করা হয় ঃ

১। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ে রাখবো না;
২। উপহার অথবা ঘুষ গ্রহণ করবো না;
৩। ভোট পাবার অথবা দেবার জন্য অর্থ বিনিময় করবো না;
৪। চিকিৎসকরূপে, রোগীর রোগ উপশমকে বিলম্বিত করবো না;
৫। বিবাহে অথবা বাক্‌দানে অর্থগ্রহণ করবো না।

অণুব্রতের উপরোক্ত (শিথিল) শপথ বা ব্রতগুলি নেতিবাচক হলেও তাদের এক ইতিবাচক দিক আছে। ঐসব শপথ পালনের মধ্যে দিয়ে গৃহীর অর্থাৎ শ্রাবকের মন ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ হয়, ভোগ বাসনা ক্রমশ তিরোহিত হয় এবং ধীর কিন্তু বলিষ্ঠ পদে সে মুক্তি লাভের পথে অগ্রসর হয়। অণুব্রত অনুসরণের মাধ্যমে শ্রাবকের অন্তর পরিশুদ্ধ হলে, বাসনামুক্ত হলে, সংসার-বন্ধন শিথিল হলে, সে মহাব্রত পালনের উপযোগী হয় এবং সেই ব্রত পালনের মাধ্যমে অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন, অনন্তশক্তি ও অনন্ত-আনন্দ লাভের দুর্গম পথে অগ্রসর হয়।

জৈনমতে, জীবই তার বন্ধনের কারণ এবং অনন্ত-সুপ্তশক্তিসম্পন্ন জীবই সেই বন্ধনের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। তবে মুক্তির পথ সুগম নয়, অতি দুর্গম। মঠবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবল এই দুর্গম পথের অভিযাত্রী হতে পারে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে পঞ্চমহাব্রত উদ্‌যাপন করে। পঞ্চমহাব্রত পালনের উপযুক্ত হবার জন্য গৃহী অর্থাৎ শ্রাবকদের প্রথমে পঞ্চ-সহজব্রত বা অণুব্রত অনুসরণ করতে হয়।

১১.৩ শাস্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ
Different Theories of Punishment

শাস্তিদানের মূল নীতি ও শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে তিনটি মূল মতবাদ আছে। যথা— (ক) **প্রতিরোধাত্মক মতবাদ** (*Preventive or Deterrent theory*), (খ) **সংশোধনাত্মক মতবাদ** (*Reformative theory*) এবং (গ) **প্রতিশোধাত্মক মতবাদ** (*Retributive theory*)।

(ক) **প্রতিরোধাত্মক মতবাদ** (*Preventive or Deterrent theory*)

এই মতবাদ অনুসারে, সমাজ বা রাষ্ট্রের অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হল, অপরাপর ব্যক্তিকে অনুরূপ অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা। বিচারক যখন কোন অপরাধীকে শাস্তি দেন তখন তিনি ঐ 'অপরাধীর শাস্তিকে' অপরাপর ব্যক্তির

'To reduce crime to a pathological phenomenon, is to sap the very foundations of our moral ... as well as punishment, are thereby undermined. Such a

... একটি দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করেন, যাতে অপরাপর ব্যক্তি ঐ শাস্তির ভয়ে অনুরূপ অপরাধ থেকে বিরত থাকে। অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে বিচারক যেন তাকে এটাই বলতে চান, 'ভেড়া চুরির অপরাধে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, তোমাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য হল— অপরে যাতে ভেড়া চুরি না করে।'[৪] শাস্তি দেবার প্রধান উদ্দেশ্য হল অপরাধ নিবারণ করা, এবং ঐ অপরাধ নিবারণ করতে হলে অপরাধীকে এমন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন যাতে সেই শাস্তির ভয়ে অপরাপর ব্যক্তি ঐ প্রকার অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে।

এই মতবাদের সমর্থকগণ তাই লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডকেও সমর্থন করেন, ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুদণ্ডকেও সমর্থন করেন। এঁদের যুক্তি হল, শাস্তিকে দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করতে হলে গুরুদণ্ডের দৃষ্টান্তই বেশী কার্যকর হয়। লঘু শাস্তির দৃষ্টান্ত অপরের মনে ভীতি-ভাব সঞ্চারিত করতে না পারায় অনুরূপ অপরাধ থেকে তারা নিবৃত্ত হয় না। অপরাধ নিবারণের জন্য তাই গুরুদণ্ডের, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের, প্রয়োজন হয়। গুরুদণ্ডকে দৃষ্টান্তরূপে প্রয়োগ করলে অপরাধ লক্ষণীয়ভাবে নিবারিত হতে পারে— এটাই হল প্রতিরোধাত্মক মতবাদের সমর্থকদের অভিমত।

সমালোচনা (*Criticism*) :

(১) ম্যাকেঞ্জি এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উত্থাপন করে বলেছেন, **'এখানে মানুষকে (অপরাধীকে) কেবল 'উপায়রূপে' ব্যবহার করা হয়, 'লক্ষ্য' বা 'উদ্দেশ্যরূপে' নয়।'**[৫] অপরাধীকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য অপরাধীর কল্যাণসাধন নয়, অপরের কল্যাণসাধন; অপরাধীকে এখানে অপরের কল্যাণসাধনের উপায়রূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মানুষকেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে মনুষ্যত্ব এবং ঐ মনুষ্যত্বের সাধনই হচ্ছে মানুষের সর্ববিধ কর্মের লক্ষ্য বা আদর্শ। মানুষকে উপায় রূপে ব্যবহার করলে ঐ মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করা হয়। এইজন্যই কান্ট বলেছেন, 'প্রত্যেক বিচারশীল ব্যক্তিকে সর্বদা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহার কর, কখনই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার কোরো না।'[৬]

অধ্যাপক লিলি (*Lillie*) অবশ্য ম্যাকেঞ্জির উপরোক্ত অভিযোগটিকে সঠিক বলেননি। লিলির মতে, মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অপরাপর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রতিরোধাত্মক মতবাদের সমর্থকগণ অপরাধীকে উপায়রূপে গ্রহণ করেন না, লক্ষ্যরূপেই গ্রহণ করেন। লিলির বক্তব্য হল— শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীরও চারিত্রিক উন্নতি ঘটে, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শাস্তি ভোগের পর অপরাধী শাস্তির ভয়ে অপরাধ থেকে বিরত থাকে। তবে, লঘু শাস্তি অপরাধীর জীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় যে, লঘু শাস্তি ভোগের পর অপরাধী পুনরায় অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। এজন্যই প্রতিরোধাত্মক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকগণ গুরুদণ্ডকে সমর্থন করেন।

(২) ম্যাকেঞ্জির আপত্তিটিকে স্বীকার না করলেও অধ্যাপক লিলি প্রতিরোধাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে অপর একটি আপত্তির উল্লেখ করেছেন। লিলির মতে, শাস্তিকে 'দৃষ্টান্তরূপে' গ্রহণ করার মধ্যেই এই মতবাদের আসল দুর্বলতা নিহিত। **শাস্তিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করলে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড সমর্থিত হয়, যা আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী।** ন্যায়-নীতি (*justice*) অনুসারে, অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিচার করেই অপরাধীকে শাস্তি দিতে হয়— লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড তাই ন্যায়-নীতি বিরোধী। প্রতিরোধাত্মক মতবাদ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডকে সমর্থন ক'রে আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞানের প্রতি, ন্যায়-নীতির প্রতি সুবিচার করে না। লিলিকে অনুসরণ করে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যায়; অযোগ্য শিক্ষক যখন শ্রেণীর ছাত্রদের সংযত রাখার উদ্দেশ্যে অমনোযোগী কোন ছাত্রকে কঠোর শাস্তি দেন তখন বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার দিক থেকে তাকে সমর্থন করা গেলেও ন্যায়-নীতির দিক থেকে সমর্থন করা যায় না।[৭]

৪ 'It is expressed in the familier dictum of the judge— 'You are not punished for stealing sheep, but in ... Ethics, Mackenzie. P. 374.
... P. 395.

(৩) আবার, শাস্তিকে যদি কেবল 'দৃষ্টান্তরূপেই' ব্যবহার করা হয়, তাহলে প্রকৃত অপরাধীর পরিবর্তে যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়াটাও সমর্থিত হয়, যাকে কোনভাবেই ন্যায়সম্মত (*moral*) বলা যায় না। লিলির মতে, প্রতিরোধাত্মক মতবাদের এটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ। বিচারকের রায়ে (*verdict*) যদি বলা হয়, 'ভেড়া চুরির অপরাধে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না; তোমাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য হল— অপরকে ভেড়া চুরি করা থেকে নিবৃত্ত করা'— তাহলে নির্দোষ যে কোন ব্যক্তিকে ভেড়া চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। স্পষ্টতই, প্রতিরোধাত্মক মতবাদে দোষী ও নির্দোষীর মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। 'শাস্তির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয়— শাস্তিকে দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করে মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত করা, তাহলে দোষী-নির্দোষী নির্বিশেষে শাস্তি সমর্থিত হয়— এটাই হল প্রতিরোধাত্মক মতবাদের আসল দুর্বলতা বা ত্রুটি।'[৮] অযোগ্য শিক্ষক যদি তাঁর শ্রেণীর ছাত্রদের বশে আনার জন্য কোন একটি নির্দোষ ছাত্রকে কঠোর শাস্তি দেন, তাহলে ন্যায়-নীতির দিক থেকে তাকে কখনই সমর্থন করা যায় না।

(৪) উপসংহারে একথাই বলতে হয় যে, এই মতবাদের সমর্থকরা কেবল শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত করতে চায়; কিন্তু শাস্তির ভয়ে মানুষের অন্তরের পরিবর্তন বা অন্তর শুদ্ধি হয় না। এজন্য, শাস্তির ভয়ে মানুষ সাময়িকভাবে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত থাকলেও, অন্তর-শুদ্ধি না হওয়ায়, অপরাধ-প্রবণতার নিবৃত্তি হয় না। অপরাধ-প্রবণতাকে নিবারিত করতে হলে শাস্তি ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যা মানুষের শুভবুদ্ধিকে, নৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করতে পারে।

(খ) সংশোধনাত্মক মতবাদ (*Reformative theory*)

এই মতবাদ অনুসারে, শাস্তির উদ্দেশ্য হল, শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে অপরাধীর চরিত্রকে সংশোধন করা এবং চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে অপরাধীকে অপরাধ থেকে বিরত করা। অপরাধীকে এমন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন যাতে তার চরিত্র সংশোধিত হয় এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ অপরাধ আর না করে। স্পষ্টতই, **এই মতবাদে অপরাধীকে উপায়রূপে গণ্য না করে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যরূপেই গণ্য করা হয়।** এখানে অপরের চরিত্রের নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্যই তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। অপরাধীকে লক্ষ্যরূপে গণ্য করে তারই চরিত্র সংশোধনের জন্য শাস্তি দেওয়া হলে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করা যায় না, কেননা দণ্ড যদি মৃত্যু হয় তাহলে 'অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন' কথাটির অর্থই হয় না। জীবদ্দশাতেই চরিত্রের সংশোধন হতে পারে, মৃত্যুর পরে নয়। দৈহিক মৃত্যুর পর অপরাধীর আত্মার অস্তিত্ব থাকে অথবা থাকে না, যদি থাকেও তাহলে তার উন্নতিসাধন সম্ভব অথবা সম্ভব নয়—এই প্রশ্ন নীতিবিদ্যা বা সমাজবিদ্যার নয়। এজন্য **সংশোধানাত্মক মতবাদের সমর্থকগণ অপরাধীর প্রাণদণ্ড সমর্থন করেন না, এমনকি অন্য কোন গুরুদণ্ডও সমর্থন করেন না।**

বর্তমান কালের অনেকেই শাস্তি সম্পর্কে সংশোধনাত্মক মতবাদটিকে সমর্থন করেন। ম্যাকেঞ্জি বলেন, 'মানবতাবাদী মনোভাবের সঙ্গে মতবাদটি সঙ্গতিসম্পন্ন হওয়ায় সাম্প্রতিককালের অনেকেই এই মতবাদটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন।'[৯] সাম্প্রতিককালের অপরাধ সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞান (*Criminal Sociology*), অপরাধ সংক্রান্ত নৃতত্ত্ব (*Criminal Anthropology*) এবং মনোসমীক্ষক ফ্রয়েড (*Freud*) সংশোধনাত্মক মতবাদকেই সমর্থন করে বলেন যে, সমাজ বা রাষ্ট্রের কর্তব্য হল অপরাধীকে শিক্ষা দেওয়া, তার চরিত্রের দোষ সংশোধন করা, যাতে ভবিষ্যতে সে অপরাধমূলক কর্ম না করে স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

সাম্প্রতিককালের সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত হল— প্রতিকূল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের জন্যই মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয়। কাজেই, অপরাধের জন্য অপরাধী দায়ী নয়, দায়ী পরিবেশ। সমাজবিজ্ঞানীরা

৮. 'The real weakness of deterrent theory is that, if the only purpose of punishment is to deter people from wrong-doing, it does not really matter whether the person punished is himself innocent or guilty.' Ibid. P. 253.

তাই বলেন, অপরাধীর শাস্তি বিধানের পরিবর্তে সমাজের বৈষম্য-ব্যবস্থা অপনীত করা প্রয়োজন— সামাজিক বৈষম্য, দুর্নীতি ইত্যাদি অপনীত হলে অপরাধও অপনীত হবে। তেমনি আবার অপরাধ সংক্রান্ত নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের অভিমত হল— অপরাধ এক রোগ-বিশেষ, মানসিক রোগ বা অসুস্থতা। রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্য যেমন তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না, তেমনি অপরাধ-রোগ নিরাময়ের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত নয়। মনোসমীক্ষক ফ্রয়েড আবার বলেন, জন্মগত অপরাধ প্রবণতার জন্য মানুষ অপরাধ করে; অপরাধে লিপ্ত হওয়ার মূলে হচ্ছে জন্মগত বা সহজাত অপরাধ-প্রবণতা। যাদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রবলরূপে থাকে তারা অপরাধে লিপ্ত না হয়ে পারে না। মানুষ স্বেচ্ছায় অপরাধ করে না, প্রবৃত্তির তাড়নায় অপরাধে লিপ্ত হয়। সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার ভাল-মন্দ বিচার হতে পারে না, কেবল স্বেচ্ছাকৃত কর্মেরই ভাল-মন্দ বিচার হয়। স্বেচ্ছাকৃত কর্মের জন্য মানুষ পুরস্কৃত হয় অথবা শাস্তিভোগ করে। অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত কর্ম না হওয়ায় তা শাস্তিযোগ্য হতে পারে না।

কিন্তু অপরাধ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের উপরোক্ত অভিমতে সংশোধনাত্মক মতবাদের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। **বাস্তবিকপক্ষে, সংশোধনাত্মক মতবাদে শাস্তির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়নি; মতবাদটিতে যা বলা হয়েছে তা হল—'শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন'**। একথার অর্থ হল, অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষাদান, চিকিৎসা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রয়োজনীয় হলেও সেই সঙ্গে দুঃখদায়ক শাস্তিরও প্রয়োজন আছে। একথা ঠিক যে, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা সর্বোৎকৃষ্ট উপায় নয়; তথাপি সংশোধনাত্মক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকগণ অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না। এঁদের বক্তব্য হল— শাস্তির প্রকৃতি এমন হতে হবে যাতে অপরাধী তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং সেটাই হবে তার আসল শিক্ষা বা চরিত্রের সংশোধন-ব্যবস্থা। দৈহিক যন্ত্রণার পরিবর্তে তাই মানসিক দুঃখবোধ জাগ্রত করেও শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, এবং সংশোধনাত্মক মতবাদের সমর্থকগণ দ্বিতীয় পন্থাটিকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এঁদের মতে, মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করেই অপরাধীকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তার নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করা যায়। **কারাগারে আটক রেখে অথবা নিঃসঙ্গ রেখে অপরাধীকে যে পরিমাণ দুঃখ দেওয়া যায় তা যে কোন দৈহিক নির্যাতনের যন্ত্রণা অপেক্ষা অনেক বেশী অসহনীয়**। এইজাতীয় শাস্তির মাধ্যমেই অপরাধী তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে নিজ চরিত্রের উন্নতিসাধন করতে পারে।[১০] শাস্তির মাধ্যমে এইপ্রকার উপলব্ধিই হচ্ছে অপরাধীর আসল শিক্ষা, চরিত্রের সংশোধন। সার কথা হল, **সংশোধনাত্মক মতবাদের সমর্থকগণ অপরাধীর শাস্তির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না; তবে তাঁরা যে শাস্তির কথা বলেন তা লঘুশাস্তি, কখনই মৃত্যুদণ্ড নয়।**

সমালোচনা (*Criticism*) :

(১) শাস্তি সম্পর্কে এই মতবাদ মানবতাবাদের দিক থেকে উচ্চ-প্রশংসিত হলেও তা ত্রুটিমুক্ত নয়। শাস্তির উদ্দেশ্য যদি অপরাধীর চরিত্রের সংশোধন হয় তাহলে মৃত্যুদণ্ডকে কোন ক্ষেত্রেই সমর্থন করা যায় না, এবং মূলত এই কারণেই সংশোধনাত্মক মতবাদকে গ্রহণ করা যায় না। অপরাধী যখন **চরম অপরাধ** করে, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় পরিকল্পনা মাফিক মানুষকে হত্যা করে, তখন তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিলে নৈতিক নিয়মের মর্যাদা থাকে না। তাছাড়া এই জাতীয় অপরাধীর বেঁচে থাকা সমাজের পক্ষে অনেক উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হতে পারে, কেননা ভবিষ্যতে ঐ অপরাধী আরও অনেক মানুষের প্রাণনাশ করতে পারে। কাজেই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সমাজের উপকারার্থে এজাতীয় অপরাধীকে সংশোধন করার পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(২) সংশোধনাত্মক মতবাদের সমর্থক সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের অভিমতও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিরুদ্ধ পরিবেশ অপরাধের একটি শর্ত হলেও সমগ্র কারণ নয়। পরিবেশ বিরুদ্ধ না হলেও, স্বভাববশত অনেকে অপরাধে লিপ্ত হয়। নৃতাত্ত্বিকদের ও মনস্তাত্ত্বিকদের অভিমতও সমর্থনযোগ্য নয়— সব অপরাধ মানসিক ব্যাধিজনিত নয়। যে সব ক্ষেত্রে অপরাধ সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বৈষম্যজনিত নয়, সেসব ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তেমনি যেসব ক্ষেত্রে অপরাধ রোগজনিত নয়, সেসব ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে, এই আপত্তিটি সংশোধনাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে সুপ্রযোজ্য নয়, কেননা সংশোধনাত্মক মতবাদে শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয় না। সংশোধনাত্মক মতবাদে একথাই বলা হয় যে, শাস্তির উদ্দেশ্য হবে অপরাধীর চরিত্রের সংশোধন।

(গ) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (*Retributive theory*)

এই মতবাদ অনুসারে শাস্তির উদ্দেশ্য হল— অপরাধীকে প্রত্যাঘাত করা; 'অপরাধীর দুষ্কর্মের বোঝা তারই মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাকে এটা বোঝান যে তার দুষ্কর্মের জন্য কেবল অপরের অকল্যাণ হয়নি, নিজেরও হয়েছে।'[১১] নৈতিক ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে অপরাধী যে পরিমাণ অপরের ক্ষতি করেছে, অপরাধীকেও সেই পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার না করলে নৈতিক ও সামাজিক নিয়মের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে— প্রতিশোধমূলক শাস্তির মাধ্যমে এটাই অপরাধীকে বোঝানো হয়। এজন্য **"প্রতিশোধমূলক মতবাদে 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত' এই শাস্তিসূত্রকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়।"**[১২]

অধ্যাপক লিলি এইপ্রকার প্রতিশোধমূলক শাস্তিসূত্রের উৎসমূল প্রসঙ্গে বলেছেন[১৩]— পশু ও মানুষ উভয়েরই এক সহজাত প্রবৃত্তি হল, আঘাত পেলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রত্যাঘাত করা। আদিম মানব সমাজে এইপ্রকার আঘাতের উত্তরে প্রতিশোধাত্মক প্রত্যাঘাতের ক্ষেত্রে মানুষ যতটা আঘাত পেয়েছে তার অপেক্ষা অনেক বেশী মাত্রায় প্রত্যাঘাত করেছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটি উক্তির উল্লেখ করে অধ্যাপক লিলি প্রাচীনকালের শাস্তি-ব্যবস্থার নিদর্শন দিয়েছেন ঃ 'লামেক্ যদি কেইন্‌কে সাতবার আঘাত করে তাহলে কেইন্ অবশ্যই লামেক্‌কে সাতের সঙ্গে সত্তরবার বেশি আঘাত করবে।'[১৪] প্রত্যাঘাত যাতে আঘাত অপেক্ষা অতিমাত্রায় বেশি না হয়, সেজন্য পরবর্তীকালে শাস্তিদানের কর্তৃত্বভার ব্যক্তির কাছ থেকে গোষ্ঠী গ্রহণ করে এবং গোষ্ঠীপতি আঘাতের সমতুল্য প্রত্যাঘাতের, অর্থাৎ 'চোখের বদলে (কেবলই) চোখ এবং দাঁতের বদলে (কেবলই) দাঁত'— এইপ্রকার প্রতিশোধমূলক শাস্তি ব্যবহার প্রচলন করেন।

প্রতিশোধমূলক মতবাদের দুটি রূপ আছে। যথা— (ক) **কঠোর মতবাদ** (*Rigoristic form*) ও (খ) **লঘু মতবাদ** (*Mollified form*)। **কঠোর মতবাদ অনুসারে,** অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, তার বয়স, লিঙ্গ (স্ত্রী অথবা পুরুষ), সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাধি, কোন পরিস্থিতিতে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে— এসব **বিচার না করেই** অপরাধীকে গুরুদণ্ডে, এমনকি মৃত্যুদণ্ডে, দণ্ডিত করতে হবে। পক্ষান্তরে, **লঘু মতবাদ অনুসারে,** উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় **বিচার করেই** শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; ক্ষেত্র অনুসারে অপরাধীকে চরমদণ্ড অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে লঘুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।

মূল্যায়ন (*Evaluation*)

অনেকে এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেন, মতবাদটি মানবতা-বিরোধী, খ্রীষ্টধর্মবিরোধী। মতবাদটি বিদ্বেষপ্রসূত প্রতিশোধস্পৃহাকে চরিতার্থ করতে বলে, কিন্তু মানবতা-ভিত্তিক কোন ধর্মেই মানুষের প্রতিশোধস্পৃহাকে সমর্থন করা হয় না। কাজেই, আপত্তি হল— মতবাদটি মানবতা-বিরোধী, ধর্ম-বিরোধী।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির মতে, অভিযোগটি সঠিক নয়। মানবতা-ভিত্তিক কোন ধর্মেই প্রতিশোধস্পৃহাকে সমর্থন করা হয় না, একথা মেনে নিয়েও বলতে হয় যে, অধুনা প্রতিশোধমূলক শাস্তি ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের প্রতিশোধস্পৃহ চরিতার্থ হতে পারে না, কেননা প্রত্যাঘাতটি সেখানে কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে আসে না, আসে নিরপেক্ষ

১১. 'The aim of punishment is to allow a man's deed to return on his head, i.e. to make it apparent that the evil consequences of his act are not merely evils to others, but evils in which he is himself involved.' A Manual of Ethics. Mackenzie. P. 325.

১২. 'This theory appears to justify the law of 'eye for an eye and tooth

বিচারালয়ের কাছ থেকে, বিচারকের কাছ থেকে। 'নিরপেক্ষ বিচারকের শাস্তি কখনো বিদ্বেষপ্রসূত হয় না; কুকর্ম করে অপরাধী যা অর্জন করেছে, বিচারক কেবল সেই অর্জিত সম্পদকেই তাকে শাস্তিরূপে প্রত্যর্পণ করেন'।[১৫]

শাস্তি সম্পর্কে হেগেলের মতবাদ প্রতিশোধমূলক মতবাদ। হেগেলের মতে, 'শাস্তি হচ্ছে অপরাধীর প্রাপ্য বিষয়, বলা যায়— অপরাধীর পুরস্কার।[১৬] **অ্যারিস্টটলও** শাস্তিকে 'পুরস্কার' বলেছেন— 'নেতিমূলক পুরস্কার' (*Negative reward*)। মানুষের সুকর্ম যেমন পুরস্কৃত হয়, মানুষের দুষ্কর্মও তেমনি পুরস্কৃত হয়। দুষ্কর্মের পুরস্কার নেতিমূলক অর্থাৎ শাস্তি। বাইবেলেও (*Bible*) শাস্তিকে অপরাধীর পারিশ্রমিকরূপে উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'পাপের পুরস্কার মৃত্যু'।[১৭]

প্রতিশোধমূলক মতবাদের সার কথা হল— সমাজ বা রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা সুরক্ষার জন্য, নৈতিক ও সামাজিক নিয়মের মর্যাদা রক্ষার জন্য, অপরাধীর শাস্তির প্রয়োজন। সমাজে বসবাস করতে হলে সেই সমাজের কল্যাণমূলক নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং তাতে আমাদের নৈতিক জীবনেরও উন্নতি ঘটে। সমাজের জনকল্যাণমূলক নিয়মগুলি লঙ্ঘন করলে মানুষকে আবার সেই বর্বর সমাজে ফিরে যেতে হয়, যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে হব্‌স্ (*Hobbes*) বলেছেন, 'ঘৃণ্য, বর্বর ও ক্ষণস্থায়ী'। 'সুসংবদ্ধ সমাজে বসবাসের জন্য যেসব নিয়ম মেনে চলা অত্যাবশ্যক, সেইসব নিয়ম যারা অমান্য করে তাদের শাস্তিও অত্যাবশ্যক।[১৮]

১১.৪ শাস্তি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মতবাদ
Satisfactory Theory of Punishment

শাস্তি সম্পর্কে আলোচিত প্রত্যেকটি মতবাদ আংশিক গ্রহণীয় হলেও তাদের কোনটিও সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক বা গ্রহণীয় নয়। শাস্তি সম্পর্কে সন্তোষজনক মতবাদে আলোচিত তিনটি মতবাদেরই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন ঃ (১) সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী অপরের যে ক্ষতি করেছে, ন্যায়নীতি অনুসারে, অপরাধীকেও সেই পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হবে (প্রতিশোধমূলক মতবাদ); (২) শাস্তির উদ্দেশ্য হবে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা (সংশোধনমূলক মতবাদ), এবং (৩) শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীকে এবং অপরাপর অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কর্ম থেকে বিরত রাখতে হবে (প্রতিরোধমূলক মতবাদ)। তিনটি মতবাদের এই তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে তবেই শাস্তি সম্পর্কে একটি সন্তোষজনক মতবাদ পাওয়া যেতে পারে।

তবে, শাস্তি সম্পর্কে তিনটি মতবাদের মধ্যে **প্রতিশোধমূলক মতবাদই যে অপেক্ষাকৃত বেশী সন্তোষজনক, এমন বলা যেতে পারে**; কেননা এই মতবাদের মধ্যে অপর দুটি মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অধিকাধিক নিহিত আছে। প্রতিশোধমূলক মতবাদ অনুসারে, সমাজের সুস্থিতির জন্য সামাজিক ও নৈতিক নিয়মের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কাজেই, কোন ব্যক্তি যদি সামাজিক ও নৈতিক নিয়মের অমর্যাদা করে, তাহলে ন্যায়-নীতির দাবী অনুসারে, তাকে শাস্তি পেতে হবে। সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে অপরাধী তার দুষ্কৃতির জন্য শাস্তিকে পারিশ্রমিকরূপে অর্জন করে এবং সেই প্রাপ্য-পারিশ্রমিক অপরাধীকে না দিলে তা অনুচিত হবে। ন্যায়-নীতির দাবী অনুসারেই অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে।

এইপ্রকারে, প্রতিশোধমূলক মতবাদ অনুসরণ করে অপরাধীকে শাস্তি দিলে অপরাধী এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, মহামূল্যবান সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম অমান্য করার জন্যই তাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। এইপ্রকার উপলব্ধি থেকেই তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয় এবং ধীরে ধীরে চরিত্রেরও সংশোধন হতে থাকে। আবার শাস্তিভোগের জন্য অপরাধী নিজে এবং অপরাধীর ভোগান্তি চিন্তা করে অপরাধপ্রবণ অপরে অপরাধ থেকে

---

১৫. 'Retribution inflicted by a court of justice need not involve any such feeling (i.e. melevolence). Such a court simply accords to a man what he has earned. 'Manual of Ethics. Mackenzie. P. 375.
১৬. Ibid. P. 380.
১৭. 'The wage of sin is death'. Quotation from Mackenzie's Manual of Ethics. P. 380.
১৮. 'If the laws are necessary condition of our life in organised societies, then there must be some

বিরত হতে পারে। ম্যাকেঞ্জি বলেন, 'অপরাধী যখন উপলব্ধি করে যে তার শাস্তি তারই দুষ্কৃতির স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত পরিণতি তখন স্বভাবতই সে অনুশোচনা করে; এবং ঐ প্রকার উপলব্ধি হলে অপরের মনেও অপরাধের প্রতি প্রকৃত ঘৃণার উদ্রেক হয়',[১৯] যা তাকে অপরাধ থেকে বিরত রাখে।

স্পষ্টতই, প্রতিশোধমূলক শাস্তির মাধ্যমে যেমন অপরাধীর চরিত্র সংশোধন হতে পারে, তেমনি অপরেও অপরাধীর শাস্তির কথা চিন্তা করে, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে। কাজেই, প্রতিশোধমূলক মতবাদে অপর দুটি মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্য অধিকাধিক নিহিত থাকায়, এই মতবাদটিকেই অধিকতর সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। তবে, প্রতিশোধমূলক মতবাদকে অপেক্ষাকৃত বেশী সন্তোষজনক বলা গেলেও ঐ মতবাদের লঘু প্রকারটিকেই (*Mollified form*) গ্রহণ করতে হয় যেখানে শাস্তি দেবার পূর্বে অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, অপরাধীর বয়স, লিঙ্গ, স্বাস্থ্য, রোগ, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিচার পূর্বক অপরাধের গুরুত্ব নির্ধারণ করে তদনুসারে শাস্তি দেওয়া হয়।